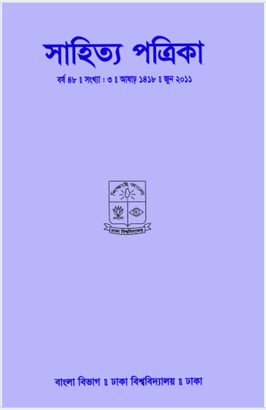

Vol. 48 | No. 3 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বাংলা পরিভাষা: গঠন ও প্রয়োগ-কাঠামো

Volume	48
Issue	3
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মিথুন ব্যানার্জী
Published online	June 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i3.12
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i3.12
Pages	199-212
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বাংলা পরিভাষা : গঠন ও প্রয়োগ-কাঠামো

Check for updates

মিথুন ব্যানার্জী*

বৈশ্বিক জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন প্রপঞ্চ (phenomenon) ও ধারণাকে (concept) কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষায় সংজ্ঞাপিত করবার সুপ্রচলিত উপায় হলো সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের উপযুক্ততম পরিভাষা প্রণয়ন। কোনো বিষয়ের পরিভাষা বলতে বোঝায় এমন কতগুলো শব্দ যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণাসমূহকে সংহত অবয়বে যথার্থ, নির্ভুল ও দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করে থাকে। বিভিন্ন জ্ঞানশৃঙ্খলায় ব্যবহৃত হয় কিছু 'অভিধা' জাতীয় শব্দ যা ওই শৃঙ্খলা-সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহকে সুস্পষ্ট করে। এরকম চাবিশব্দই (keyword) পরিভাষা হিসেবে পরিচিত। পরিভাষা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে নতুন জ্ঞান আয়ত্ত করবার সুযোগ যেমন সৃষ্টি হয় তেমনি এর সূত্র ধরে ভাষারও 'শক্তিবর্ধন' ঘটে থাকে (রাজশেখর বসু; ১৩৪০)। অন্য কথায়, একটি ভাষায় দীর্ঘদিনের জ্ঞানচর্চার ফলে পরিভাষা গড়ে ওঠে। বাংলা ভাষার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, উনিশ শতক থেকে বাংলা ভাষায় আন্তর্দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা যত বেশি প্রসার লাভ করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিভাষা প্রণয়নের বিষয়টিও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেননা, স্বতন্ত্র জ্ঞানশাখার জন্য প্রয়োজন হয় স্বতন্ত্র পারিভাষিক শব্দ। আর এ কারণেই উল্লিখিত সময় থেকেই বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়ে আসছে। বর্তমানেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সাধারণভাবে পারিভাষিক শব্দের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলা যায় যে, সংশ্লিষ্ট শব্দটি 'একটি সুনির্দিষ্ট ও অদ্ব্যর্থ তাৎপর্য জ্ঞাপন করে, একাধিক তাৎপর্য কখনোই জ্ঞাপন করে না, এবং কোন বিশেষ তাৎপর্য নির্দেশের জন্য কখনোই ব্যবহৃত হয় না একাধিক শব্দ' (হুমায়ুন আজাদ; ১৯৮৫ : ৪৪৭)। কিন্তু বাংলা পরিভাষার ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায় যে, একই তাৎপর্য নির্দেশের জন্য রয়েছে একাধিক শব্দ। আবার একই শব্দ দিয়ে নির্দেশিত হয় একাধিক তাৎপর্য। এই বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হুমায়ুন আজাদ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থের নিরিখে বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি পারিভাষিক শব্দ 'সুনির্দিষ্ট ও অদ্ব্যর্থ' এবং একক তাৎপর্যে সংজ্ঞাপিত হওয়ার সামর্থ্য অর্জন না করে, সেই সঙ্গে ওই জ্ঞানশৃঙ্খলা-সংশ্লিষ্ট ব্যাপক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত ওই শব্দটির একাধিক বিকল্প রূপ তৈরি হতে থাকাই স্বাভাবিক। এই দিকগুলোকে বিবেচনা করে বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা ভাষা ও সহিত্যবিষয়ক পরিভাষার গঠন-কৌশল ও এদের প্রয়োগ-কাঠামো নিরূপণ করবার চেষ্টা করা হবে। বিষয়টি আলোচনার জন্য বাংলা পরিভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করে ভাষা-পরিকল্পনার (language planning) তত্ত্বীয় নির্দেশনার আলোকে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারিক বহুমাত্রিকতা, এর প্রয়োগতাত্ত্বিক (pragmatic) বিভিন্ন দিকসমূহ তুলে ধরা হবে এবং ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বাংলা পরিভাষার বিভিন্ন প্রচলিত উদাহরণ বিশ্লেষণ করে দেখানোর পাশাপাশি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হবে।

* সহযোগী গবেষণা সমন্বয়ক, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

১. বাংলা পরিভাষার ইতিহাস

১.১ পটভূমি

একটি ভাষাকে অধিকতর আধুনিক ও সমৃদ্ধ করে তোলার অন্যতম কার্যকর উপায় হলো সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও অন্যান্য আধুনিক শাস্ত্রচর্চার উপযোগী পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করা। উনিশ শতকে বাংলা ভাষার মানরূপ বিধিবদ্ধকরণ ও আধুনিকীকরণ-প্রক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টির ওপর। বাংলা ভাষায় রয়েছে আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারিভাষিক শব্দ। প্রচলিত বিভাজন অনুসারে বাংলা ভাষার আধুনিক কালের সূচনাপর্ব থেকেই বাংলা ভাষায় বিভিন্ন জ্ঞানশাখার চর্চার জন্য পরিভাষা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে ক্রমান্বয়ে বাংলা ভাষায় পারিভাষিক শব্দের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার গড়ে ওঠে।

গদ্যের ব্যবহার, বাংলা ভাষায় অভিধান প্রণয়ন ও নানাবিধ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার সূত্র ধরে উনিশ শতক থেকেই ভাষা চর্চার এক অপরিহার্য অংশ হিসেবে সৃষ্টি হতে থাকে বাংলা পারিভাষিক শব্দাবলি। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলা পারিভাষিক শব্দের উৎস-ভাষা প্রায় এককভাবে ইংরেজি। মূলত, ইংরেজির মাধ্যমেই পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিপুল উপকরণ ও ধারণার নাম প্রবেশ করে বাংলায় (হুমায়ুন আজাদ; ১৯৮৪ : ৫৬)। এর কারণ অনুধাবন করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। কেননা ইংরেজি ভাষা তখন ছিল শাসক শ্রেণির ভাষা আর বাঙালির সে সময়ের বিদ্যা অর্জনের অন্যতম মাধ্যমও ছিল ইংরেজি। ওই সময় বাংলা পরিভাষা রচয়িতারা দৃশ্যত দুটি শ্রেণিতে ভাগ হয়ে যান : একদল যাঁরা ভাষার ব্যবহারিক দিকের প্রতি আগ্রহী, তাঁরা অবিকৃত বিদেশি শব্দ গ্রহণ করতে চেয়েছেন, আর অন্যদল যাঁরা বিশুদ্ধবাদী, তাঁরা দেশি শব্দ অর্থাৎ খাঁটি বাংলা — প্রধানত সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করতে চেয়েছেন (হুমায়ুন আজাদ; ১৯৮৪, ৫৬)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত গোল্ডস্মিথের *History of England*-এর ফেলিকস কেরিকৃত অনুবাদ *ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়* গ্রন্থটি। উদাহরণস্বরূপ, ফেলিকস কেরি প্রদত্ত কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ তুলে ধরা হল : engineer — বলপ্রজ্ঞ, anarchy — অপ্রভুত্ব, অনাধপত্য, aristocracy — কুলীন প্রভুত্ব, fanatic — ধর্মব্যগ্র ইত্যাদি। জন মাক 'প্রিনসিপালস অফ কেমিস্ট্রি' বা 'কিমিয়া বিদ্যার সার' (১৮৩৪)-এ সংকলন করেছিলেন একরাশ সংস্কৃতভিত্তিক পারিভাষিক শব্দ। যেমন : atom — পরামাণু, heat — তাপক, vapour — বাষ্প, cohesion — সংলাগানর্ষণ, synthesis — সমস্তকরণ, analysis — ব্যস্তকরণ ইত্যাদি। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বিদ্যাকল্পদ্রুম*-এর (১৮৪৮) নবম খণ্ডে রচনা করেছিলেন জ্যামিতিক পরিভাষা; যেমন: geometry — ক্ষেত্রতত্ত্ব, acute angle — লঘুকোণ, algebra — বীজগণিত, arithmatic — অঙ্কগণিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে সমস্ত পরিভাষা গৃহীত হয়ে গেছে বাংলা ভাষায়, সেগুলোর মধ্যে আছে, microscope — অনুবীক্ষণ, botany — উদ্ভিদবিদ্যা, colonial — ঔপনিবেশিক, orbit — কক্ষ, milkyway — ছায়াপথ, telescope — দূরবীক্ষণ, elasticity — স্থিতিস্থাপকতা, university — বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও অনেক শব্দ। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রদত্ত পারিভাষিক শব্দের মধ্যে রয়েছে : vaccination — গোমসূর্যাধান,

faculty of time — কালানুভাবকতা, eventuality — ঘটনাভাবকর্তা, stigma — গর্ভকেশর, stamen — পরাগকেশর, density — ঘনত্ব ইত্যাদি। (তথ্যসূত্র : হুমায়ুন আজাদ; ১৯৮৪ : ৫৭)।

লক্ষণীয় যে, এ সকল পরিভাষা ভাষা কিংবা সাহিত্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গের প্রতিনিধিত্ব না করলেও এ সকল উদাহরণের সাহায্যে সে সময়ের পরিভাষা চর্চার একটি চিত্র অনুধাবন করা সম্ভব। উনিশ শতকে বঙ্গীয় রেনেসাঁর বহুমুখী বিকাশের সূত্র ধরে যে ব্যাপক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়, এ সকল পরিভাষা সে প্রচেষ্টারই প্রামাণ্য নিদর্শন। দীর্ঘকাল ধরে এভাবে বিভিন্ন জনের উদ্যোগে বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থেকেছে। তবে, বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের পুরোধা ব্যক্তিত্ব নিঃসন্দেহে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। পরিভাষা প্রণয়ন যে একান্তভাবেই ভাষা-পরিকল্পনার অংশ তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তিনিই প্রথম, বাংলা ভাষায় পরিভাষা রচনার নীতিরীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন ও রচনা করেন বেশ কিছু পারিভাষিক শব্দ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (১৩০১) ও 'রাসায়নিক পরিভাষা' (১৩০২) প্রবন্ধ-দুটিতে বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি মূলত সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে প্রয়োজনানুসারে সংস্কৃত, খাঁটি বাংলা ও ইংরেজি কৃতঋণ শব্দের সহযোগে 'মিষ্ট' পরিভাষা সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; ১৩০১)। একই সঙ্গে, বাংলা পরিভাষার ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূলত কবি হওয়ার কারণেই তাঁর প্রণীত পরিভাষায় সবসময়ই একটি বাড়তি তাৎপর্য লক্ষ করা গেছে। এর প্রমাণ মেলে culture - সংস্কৃতি, radio - আকাশবাণী, tradition - ঐতিহ্য, minister of sports - কেলিসচিব ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দে (তথ্যসূত্র : হুমায়ুন আজাদ; ১৯৮৪ : ৫৭)। বাংলা ভাষার প্রধান লেখকেরা বিভিন্ন পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক ধারণা বিরামহীনভাবে প্রকাশ করেছেন নিত্যনতুন পারিভাষিক শব্দ তৈরি করে। তাঁরা সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, এমনকি বিজ্ঞানের কিছু প্রধান ধারণারও পরিভাষা গঠন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও আরো অনেকে গঠন করেছেন দার্শনিক, নান্দনিক ও বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ।

উনিশ শতকে বাংলা পরিভাষা রচনার কৌশল থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রচয়িতাগণ কোনো একক নীতি অনুসরণ করেননি। কোনো সুনির্দিষ্ট পরিভাষা-পরিকল্পনা না থাকায় তাঁরা নিজেদের মেধা-মনন, যুক্তিবোধ ইত্যাদির সাহায্যে নিজস্ব পরিভাষা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ফলে একই শব্দের সৃষ্টি হয়েছে একাধিক পরিভাষা। আবার তাঁদের কৃত অনেক পরিভাষাই ব্যবহারিক গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ায় হারিয়ে গেছে। পরিভাষা প্রণয়নের এই ধারাকে অধিকতর নিয়মতান্ত্রিক করবার প্রেরণা থেকেই পরবর্তী পর্যায়ে একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গৃহীত হয়। মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এই দুয়ের সমন্বিত প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বাংলা পরিভাষা বর্তমান স্তরে উপনীত হয়েছে। একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমবেত চেষ্টা, সমন্বিত আকাঙ্ক্ষা ও আন্তরিক প্রণোদনা পরিভাষা প্রণয়নের চাবিকাঠি (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; ১৩৭১)।

১.২ প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা

উনিশ শতকের প্রথম নয়-দশকব্যাপী পরিভাষা প্রণয়নের ব্যক্তিগত, বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে ধারাবাহিক, প্রণালিবদ্ধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেয় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'। ১৮৯৪ থেকেই ধারাবাহিকভাবে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষা। এ পরিষৎ প্রধানত গুরুত্ব দিয়েছে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের ওপর (হুমায়ুন আজাদ; ১৯৮৪ : ৫৭) । প্রায় সমকালে অর্থাৎ ১৩০১-১৩৩০ কালপর্বে আলোক বিজ্ঞান, চৌম্বক ও তড়িৎ বিজ্ঞান, পদার্থ ও জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা, গণিত, ভূগোল, জ্যোতিষশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের প্রচুর পারিভাষিক শব্দ প্রণীত হয়। ১৩৩১ থেকে পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেয় 'প্রকৃতি' নামক বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকাটি। এটিতে প্রায় প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয় একন্দ্রনাথ ঘোষ, উমাপতি বাজপেয়ী, গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সংকলিত পরিভাষা। এসব পরিভাষা সংকলনে বিভিন্ন প্রণেতা আপন ভাষাজ্ঞান ও রুচি অনুসারে প্রধানত সংস্কৃত শব্দে রচনা করেন পারিভাষিক শব্দ। জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী 'প্রকৃতি'তে প্রকাশিত তাঁর 'প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা' (১৩৪০) নামক রচনাটিতে প্রথমে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এক একটি ইউরোপীয় পারিভাষিক শব্দ; দিয়েছেন তার গৃহীত সংজ্ঞা, তারপর ওই শব্দটির জন্যে অন্য যেসব বিকল্প পরিভাষা রয়েছে পূর্ণ তথ্যসহ পরিবেশন করেছেন সে-সব শব্দের তালিকা; ব্যাখ্যা করেছেন ওই সব শব্দের বৈশিষ্ট্য, গ্রহণযোগ্যতা-অযোগ্যতা ও পরিশেষে গ্রহণ করেছেন সবচেয়ে যথাযথ শব্দটি এবং বাংলায় তার অর্থ লিপিবদ্ধ করেছেন (হুমায়ুন আজাদ; ১৯৮৪ : ৫৭)। বলা যেতে পারে, অনেকটা অসচেতনভাবেই এভাবে পরিভাষা প্রণয়নে আধুনিক ভাষা-পরিকল্পনার যুক্তিভিত্তিক তত্ত্বকাঠামোর ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

২. বাংলা পরিভাষা তৈরির নীতিমালা

বিশ শতকের তিরিশের দশকের মধ্যভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি (১৯৩৪) গঠন করে। ১৯৩৫-৪৩ কালপর্বের মধ্যে গণিত, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, শারীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্যবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ভূবিদ্যার পরিভাষা সংকলিত হয়। ষাটের দশকে বাংলাদেশে পরিভাষা রচনা ও সংকলনের উদ্যোগ নেয় দুটি প্রতিষ্ঠান : বাংলা একাডেমী ও কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড। উভয় প্রতিষ্ঠানই কয়েকটি পরিভাষা কোষ প্রকাশ করেছে। এসব উদ্যোগ পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায় যে, পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যধারাতেই ভাষা-পরিকল্পনা নির্দেশিত অবয়ব পরিকল্পনার (corpus planning) সাহায্যে পরিভাষার সুস্পষ্ট, তাত্ত্বিক ও প্রণালি পদ্ধতিগত নীতি তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; বরং প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সংকলকের ওপর অর্পণ করেছে পরিভাষা রচনার ভার। এসব পরিভাষা প্রণয়ন প্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই নির্ভর করেছে পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষার ওপর। কখনো সংস্কৃত উপাদানে, কখনো সরাসরি ইংরেজি শব্দ গ্রহণ করে মেটাতে চেয়েছে পরিভাষার অভাব। ১৯৭৬-এ বাংলা

একাডেমীর 'কেন্দ্রীয় পরিভাষা কমিটি' নীতিমালা তৈরিতে সচেষ্ট হয়। ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ সম্পর্কে বাংলা একাডেমী বিভিন্ন সময়ে পাঁচ বার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বাংলা একাডেমীর নীতিমালার উল্লেখযোগ্য কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হলো :

১. একটিমাত্র ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের জন্যে একটিমাত্র বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচনের নীতি অনুসরণ করতে হবে। ইংরেজি পরিভাষার সমার্থক শব্দসমূহের (synonyms) জন্য একটিমাত্র বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচিত হবে। কোনও ইংরেজি শব্দ যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে তাহলেই কেবল পৃথক পৃথক বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচিত হতে পারে।

২. বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত অর্থ বা ব্যঞ্জনা অনুধাবন করে উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচন করতে হবে।

৩. নির্বাচিত প্রতিশব্দ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হতে হবে একইসঙ্গে এর শ্রুতিমাধুর্য ও সহজবোধ্যতা বিষয়েও লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

৪. যে সকল ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত সেগুলি যথাসম্ভব বাংলা পরিভাষায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। তথাকথিত আন্তর্জাতিক শব্দ অনুবাদ না করে সরাসরি বাংলায় গ্রহণের ক্ষেত্রে শব্দগুলির আন্তর্জাতিকতার দাবি বিবেচনা করে দেখতে হবে। যথার্থ ধারণা পেতে হলে কোনও ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের মতো ফরাশি, জার্মান ও রুশ এই তিনটি ভাষায় ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট প্রতিশব্দগুলি তুলনা করে দেখতে হবে। কোনও ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ যদি এই ভাষা তিনটির যে কোন দুটিতে প্রায় অভিন্ন রূপে পাওয়া যায় তাহলে ঐ শব্দটিকে আন্তর্জাতিক বলে গণ্য করা চলবে এবং ইংরেজিতে উচ্চারিত রূপটি গ্রহণ করতে হবে।

৫. ইংরেজিতে একাধিক শব্দের আদি বর্ণসমূহের সমন্বয়ে যেসব পারিভাষিক শব্দ তৈরি হয়েছে সেগুলির উচ্চারিত রূপ বাংলায় গৃহীত হবে। যেমন, Radar (Radio detection and ranging), Laser (Light amplification by stimulated emission of radiation).

৬. কোনও ইংরেজি শব্দ বাংলায় গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার গঠন-প্রকৃতি অনুযায়ী যদি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যয়াদি যোগ করা যায় তাহলে এরূপ শব্দ গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে ঐ বিদেশী শব্দের স্থলে উপযুক্ত বাংলা শব্দ খুঁজতে হবে। বিদেশী উপসর্গ ও প্রত্যয়গুলির স্থলে বাংলা উপসর্গ প্রত্যয়ের ব্যবহার যথাসম্ভব সর্বত্র একরূপ হতে হবে।

উল্লিখিত নীতিমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পুরো নীতিমালাটি মূলত দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এ দুটি হলো : স্বীকরণ নীতি এবং অনুবাদ নীতি (মুহাম্মদ এনামুল হক; ১৯৭৬)। কিন্তু আধুনিক ভাষা-পরিকল্পনার নির্দেশনা অনুসারে কোনো একটি শব্দের পরিভাষা প্রণয়ন করতে গেলে এর ব্যাকরণগত শুদ্ধতা, ভাষায় শব্দটির আত্তীকরণ-সামর্থ্য প্রভৃতি যেমন বিবেচনা করা হয় তেমনি প্রণীত পরিভাষাটির সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য, প্রয়োগতাত্ত্বিক পৌনপুনিকতা (frequency) ইত্যাদিও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। একই সঙ্গে, পরিভাষার যে একটি সৃষ্টিশীল দিক রয়েছে তা-ও আধুনিক ভাষা-পরিকল্পনায় বিশেষভাবে বিবেচ্য। কিন্তু লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত উদ্যোগসমূহে পরিভাষা প্রণয়নের সৃষ্টিশীল দিকটি মোটেই প্রাধান্য পায়নি, অথচ যতই অনুশাসন নিয়ন্ত্রিত হোক না কেন

সূক্ষ্মবিচারে পরিভাষা প্রণয়নের অন্তরালেও বিশেষ জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতার সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ আমরা সাহিত্যের একটি বহুল প্রচলিত অনুষঙ্গের কথা স্মরণ করতে পারি। ইংরেজি imagery শব্দের দুটি পরিভাষা বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে : এর একটি হলো 'চিত্রকল্প' এবং অপরটি হলো 'বাক্প্রতিমা'। গুণগত বিচারে এবং যথার্থতার মানদণ্ডে দুটো পরিভাষাই তুল্যমূল্যে বিবেচনাযোগ্য। এরূপ ক্ষেত্রে, উপর্যুক্ত নীতিমালার নির্দেশনা স্পষ্ট নয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, পরিভাষা যাদের মাধ্যমে বেঁচে থাকে অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের প্রয়োগতাত্ত্বিক অগ্রাধিকারের বিষয়টি এ সকল নীতিমালায় প্রাধান্য পায়নি। অথচ, একটি পরিভাষা যতই যাথার্থ্য গুণসম্পন্ন হোক না কেন, তার ব্যবহারিক পৌনঃপুনিকতা বেশি না হলে তা ভাষায় টিকে থাকে না। এই সূত্র ধরে পুনরায় imagery শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের আলোচনায় ফিরে আসা যেতে পারে। যেহেতু 'চিত্রকল্প' এবং 'বাক্প্রতিমা' দুটো শব্দই যাথার্থ্য গুণসম্পন্ন সেহেতু কোন পরিভাষাটি ব্যবহারকারীরা বেশি প্রয়োগ করে তার ওপর ভিত্তি করে শব্দটির পরিভাষা নির্ধারিত হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আরও একটি বিষয় সম্পর্কে এ পর্যায়ে ইঙ্গিত দিয়ে রাখা প্রয়োজন। বাংলা একাডেমীর নীতিমালা অনুসারে একই উৎস-শব্দ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানশাখায় ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করলে পৃথক পৃথক পরিভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞানে icon শব্দটির পরিভাষা করা হয়ে থাকে 'প্রতিমা', কিন্তু কম্পিউটারবিষয়ক আলোচনায় icon শব্দটি অবিকৃতভাবেই ইংরেজির অনুসরণে 'আইকন' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লক্ষণীয় যে, 'প্রতিমা' এবং 'আইকন' পারিভাষিক শব্দ দুটো পুরোপুরি ভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করে না এবং এদের প্রায়োগিক সাদৃশ্য সন্ধানও কষ্টসাধ্য নয়। অথচ, কম্পিউটারবিষয়ক আলোচনায় 'আইকন' এতটাই প্রচলিত যে, এখন হঠাৎ করে এর পরিবর্তে 'প্রতিমা' শব্দটি ব্যবহার করবার নির্দেশনা দিলেও তা কার্যকর করা বেশ কষ্টসাধ্য হবে বলেই অনুমান করা যায়। অপরদিকে, সাহিত্য কিংবা ভাষাবিজ্ঞানে 'প্রতিমা' শব্দটি উঠিয়ে ইংরেজি 'আইকন'কে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার সুযোগও নেই। এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারে সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায় না। এ ধরনের বিবিধ সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক পরিভাষা প্রণয়নের পদ্ধতি বিষয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

৩. পরিভাষা-পরিকল্পনা ও এর প্রণয়ন কৌশল বিবেচনা

পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর গঠনগত এবং প্রয়োগগত দুটো দিক বিদ্যমান। পরিভাষা গঠনের ক্ষেত্রে ভাষার ব্যাকরণিক যথার্থতা, অনুধাবনযোগ্যতা প্রভৃতি বিবেচনা করা যেমন প্রয়োজন তেমনি এর প্রয়োগতাত্ত্বিক সামর্থ্যের বিষয়টিও লক্ষ রাখা আবশ্যক। সবচেয়ে বড় কথা হলো, বাংলা ভাষার ধর্ম, এর শ্রুতিমাধুর্য এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনের মধ্যে সুসমন্বয় ঘটানো বিশেষভাবে প্রয়োজন (মুহম্মদ আবদুল হাই; ১৯৬১)। ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বাংলা পরিভাষাসমূহের গঠন ও প্রণয়ন কৌশল বিবেচনার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা

দরকার। এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে, পরিভাষাতত্ত্বে ভাষা ও সাহিত্যের জন্য বিশেষ কোনো নির্দেশনা থাকে না। তবে, লক্ষণীয় যে, এই দুটি জ্ঞানশৃঙ্খলা একান্তভাবে পরস্পরসম্পর্কিত এবং এ দুটিই অত্যন্ত মানবিক বিষয় বিধায় এদের সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহকে মানবীয় বোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে অভীষ্ট জ্ঞানমূলক সংজ্ঞাপন-সামর্থ্য অর্জন করতে হয়। এ কথার প্রমাণ মিলবে সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহের গঠনে ও প্রয়োগে। এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে ভাষা-পরিকল্পনার তত্ত্ব-কাঠামোর আলোকে পরিভাষার বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা হবে এবং উদাহরণের সাহায্যে ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হবে।

৩.১ পরিভাষার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য

পরিভাষা একটি স্বতন্ত্র অধ্যয়ন ক্ষেত্র। এটি এমন এক বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র যা ধারণা (concept) ও তার অবস্থানের (designation) মধ্যকার সর্ম্পককে ব্যাখ্যা করে। একই সঙ্গে, পরিভাষার দায়িত্ব হলো বিশেষ অভিধা সহযোগে একটি বিশেষ জ্ঞানশৃঙ্খলাকে নির্দেশনা প্রদান। পরিভাষা যেমন কোন বিশেষ ক্ষেত্রের বা শৃঙ্খলার ভাষা তেমনি পরিভাষা প্রণয়নের জন্যও প্রয়োজন বিভিন্ন জ্ঞানশৃঙ্খলার (যেমন : সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি) সক্রিয় ও মৌলিক জ্ঞান। সুতরাং, একটি শব্দের পরিভাষা প্রণয়ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানশৃঙ্খলার তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসারে যে প্রধান তিনটি ধর্ম অর্জন করা প্রয়োজন তাদের নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে :

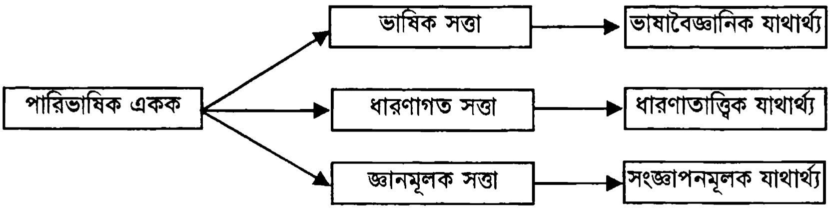

রেখাচিত্র : পরিভাষা প্রণয়ন মডেল

রেখাচিত্রটি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাব যে, একটি পারিভাষিক একককে তিনটি নির্দেশনা মেনে চলতে হয়। শব্দটিকে ভাষাগতভাবে যথার্থ অর্থাৎ ব্যাকরণসম্মত হতে হয়। একই সঙ্গে, যে ধারণাটিকে ওই শব্দটি প্রকাশ করতে চায় তা যথাযথভাবে প্রকাশিত হলো কি না তা নিরূপণ করাও সার্থক পরিভাষা প্রণয়নের জন্য আবশ্যক। চূড়ান্তভাবে, পারিভাষিক এককটিকে অর্জন করতে হয় জ্ঞানমূলক সংজ্ঞাপন সামর্থ্য; অর্থাৎ, শব্দটি দিয়ে যা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে সেই অভীষ্ট অর্থ ঠিকমত সংজ্ঞাপিত হয়েছে কি না তার ওপরও পরিভাষার যথার্থতা নির্ভর করে। এ সকল দিক বিবেচনা করে পরিভাষার অন্তত তিনটি বিশেষায়িত মাত্রা নির্দেশ করা যেতে পারে। এগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

ক) জ্ঞানমূলক মাত্রা (cognitive dimension)
খ) ভাষাবিজ্ঞানীয় মাত্রা (linguistic dimension)
গ) যোগাযোগীয় মাত্রা (communicative dimension)

পরিভাষার এই ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করবার লক্ষ্যে 'globalization' অর্থাৎ, 'বিশ্বায়ন' শব্দটি নেয়া যেতে পারে। শব্দটি ইংরেজি ভাষা থেকে আগত একটি জটিল শব্দ। গঠনগত বিবেচনায় এই শব্দটি 'global' অর্থাৎ 'বিশ্ব-সম্পর্কিত'-এর সঙ্গে অন্তঃপ্রত্যয় '-ization' যোগ করে গঠিত হয়েছে। শব্দটির এই গঠনগত দিক এর পরিভাষা তৈরির পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রথমত, পরিভাষাটির জ্ঞানমূলক মাত্রা উৎস-শব্দটিকে মানবীয় জ্ঞানশাখার একটি 'জ্ঞান একক' হিসেবে চিহ্নিত করে এর সম্পর্কিত ধারণাকে বাংলা ভাষায় বিমূর্তভাবে রূপান্তর করেছে। দ্বিতীয়ত, বিমূর্তভাবে রূপান্তরিত এই ধারণাটি উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ সন্ধানের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ধারণাটিকে আভিধানিক সহায়তায় মূর্ত করে তুলতে চেয়েছে।

অভিধানের সহায়তা গ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি নতুন ধারণা বাংলা ভাষায় যুক্ত হবার জন্য ভাষিক ব্যাকরণ নীতি অনুসরণের প্রয়োজন অনুভব করে। ফলে, শব্দটির ব্যাকরণিক রূপমূল দুটির উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে কি না তা সন্ধান করা হয়। এক্ষেত্রে অংশ দুটির পরিভাষা সুলভ হওয়ায় যথাক্রমে 'বিশ্ব' এবং '-আয়ন' রূপমূল দুটি মিলে 'বিশ্বায়ন' শব্দটি উৎসারিত হয়। এভাবে একটি নতুন ধারণা জ্ঞানশাখায় যুক্ত হলে তা ভাষিক রূপ তৈরি করে এবং নতুন ধারণাটিকে অভিধা বা নাম প্রদান করে।

নবগঠিত এই পরিভাষাটি এরপর ব্যবহৃত ও সংজ্ঞাপিত হতে শুরু করে। সুনির্দিষ্ট অর্থসহযোগে পরিভাষাটি ভাষাব্যবহারকারীদের প্রায়োগিক পৌনঃপুনিকতার সূত্র ধরে তার অবস্থানকে দৃঢ় করে তোলে। সংজ্ঞাপিত হবার মধ্য দিয়ে এটি ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট শব্দটির ব্যবহারগত দিক। যোগাযোগীয় মাত্রায় সাধারণত পরিভাষা একত্রীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং ধারণাটি ব্যাপ্তি লাভ করে। পরিভাষার ব্যাপ্তি প্রক্রিয়াটিকে সংহত করবার প্রয়োজনে সাধারণত অভিধান, শব্দকোষ, পারিভাষিক ডাটাবেজ ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

৩.২ পরিভাষার গঠন-কাঠামো

পরিভাষার বহুমাত্রিক সত্তা এর গঠনকাঠামোকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। কেননা, একটি আধুনিক পরিভাষা সৃজনের ক্ষেত্রে পরিভাষার গঠন-কাঠামোতেও এই বহুমাত্রিক নির্দেশনা বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে। সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে পরিভাষা গঠিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো : ক) নতুন শব্দরূপ তৈরি
খ) গৃহীত শব্দ পুনরায় ব্যবহার
গ) আনুবাদিক ঋণ

এই পদ্ধতি তিনটি আবার কখনো কখনো একাধিক কৌশল অবলম্বন করে থাকে। নিচে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

৩.২.১ নতুন শব্দরূপ তৈরি

এক্ষেত্রে একটি ধারণার নতুন নামকরণ করা হয় যার পূর্বে কোনো ভাষিক ভুক্তি ছিল না। উদাহরণ হিসেবে cuneiform বা 'বাণমুখলিপি' পারিভাষিক শব্দটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই শব্দটি একান্তভাবেই ভাষাবৈজ্ঞানিক জ্ঞানশৃঙ্খলার অন্তর্গত লিপিবিজ্ঞান চর্চার অংশ হিসেবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণেই এরকম লিপির সঙ্গে বাংলা ভাষীদের পরিচয় না ঘটাই স্বাভাবিক। সে কারণে লিপিটির গঠন-বৈশিষ্ট্য গুচ্ছবদ্ধ তীরের সঙ্গে চিত্রাত্মকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ বিধায় একে বাণমুখলিপি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এভাবে নতুন শব্দরূপ তৈরির প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তুলতে আবার সাধিতকরণ, যৌগিকীকরণ এবং শব্দসংক্ষেপণের সহায়তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

সাধিতকরণ : এ প্রক্রিয়ায় শব্দের শব্দ-শ্রেণি (word class) পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। একটি শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত হয়ে এ ধরনের পরিভাষা তৈরি হয়। ইতোমধ্যেই 'বিশ্বায়ন' পরিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। এরকম আরও উদাহরণ দেয়া যেতে পারে; যেমন : approximation — 'নৈকট্যায়ন', syllabification — 'অক্ষরায়ণ' ইত্যাদি।

যৌগিকীকরণ : এই প্রক্রিয়ায় দুটি মুক্ত রূপমূল একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে নতুন পরিভাষা তৈরি করা হয়। যেমন, বাংলা পরিভাষার উদাহরণ দিয়ে বলা যায় — sequence of consciousness — 'চেতনাশৃঙ্খল' (তপোধীর; ২০০৭)। এখানে দুটি আলাদা শব্দ 'চেতনা' ও 'শৃঙ্খল'কে সমন্বয় করে একটি নতুন শব্দ গঠন করা হয়েছে। এরূপ আরও কয়েকটি উদাহরণ হলো homophone বা 'সমধ্বনি', allophone বা 'সহধ্বনি', hyperbole বা 'অতিশয়োক্তি', surreal বা 'পরাবাস্তব', super ego বা 'পরাসত্তা' প্রভৃতি।

শব্দসংক্ষেপণ : এটি পারিভাষিক শব্দ তৈরি করার আরেকটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় শব্দ নির্বাচন করে তা থেকে সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে নতুন শব্দ গঠন করা হয়। শব্দসংক্ষেপণ একটি পরিণত পারিভাষিক একক। বাংলা ভাষা থেকে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো সম্ভব যে, 'VAT' (value added tax)-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে প্রচলিত রয়েছে 'মূসক' (মূল্য সংযোজন কর)। এক্ষেত্রে, VAT-এর পরিভাষা হিসেবে সরাসরি মূসক-কে গ্রহণ করা না হলেও পরিভাষিক শব্দ 'মূল্য সংযোজন কর'-এর সংক্ষিপ্ত ও প্রচলিত রূপ হিসেবে 'মুসক' শব্দটিই বাংলা ভাষিক সম্প্রদায়ের কাছে পারিভাষিক শব্দের মর্যাদায় গৃহীত হয়েছে। তবে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ায় পরিভাষা তৈরি করার প্রবণতা কম লক্ষ করা যায়।

৩.২.২ পূর্বস্থিত শব্দরূপ পুনর্বিন্যাস

কোনো শব্দের পূর্বস্থিত রূপ নতুন করে বিন্যস্ত করবার মধ্য দিয়েও নতুন পরিভাষা তৈরি হয়ে থাকে। অর্থাৎ, আগে থেকেই বাংলা ভাষায় রয়েছে এমন একটি শব্দকে যদি কেবল

একটি ভিন্ন ভাষিক উৎস শব্দের পরিভাষার জন্য সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তবে তাকে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত 'প্রপঞ্চ', 'রূপ', 'অনিয়মিত' প্রভৃতি শব্দ বিশ্লেষণ করে দেখানো যায়। উল্লিখিত প্রতিটি শব্দই বাংলা ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু আদিতে যে অর্থ তারা বহন করত পরিভাষা হিসেবে সুনির্দিষ্ট হওয়ার পর তারা প্রত্যেকেই নতুন অর্থ সহযোগে পুনর্বিন্যস্ত হয়; অথচ পূর্বের অর্থেও ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ রয়ে যায়। যেমন : 'প্রপঞ্চ' শব্দটি 'প্রহেলিকা' অর্থে প্রচলিত থাকলেও বিভিন্ন জ্ঞানশৃঙ্খলায় এটি phenomenon-এর পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। 'রূপ' শব্দটি 'ধরন' বা 'সৌন্দর্য' অর্থে ব্যবহৃত হলেও ভাষাবিজ্ঞানে morph-এর পরিভাষারূপে এটি প্রযুক্ত হয়। একইভাবে, 'অনিয়মিত' শব্দটিও বিভিন্ন জ্ঞানশৃঙ্খলায় arbitrary-এর পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। এভাবে আগে থেকেই ভাষায় আছে এমন শব্দরূপের পুনর্বিন্যাস করবার মধ্য দিয়ে পরিভাষা প্রণীত হলে তা পরিভাষা প্রণয়নের মূল নীতিমালার সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেননা, এতে করে একটি পরিভাষা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ পায়। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পরিভাষা তৈরির উল্লিখিত পদ্ধতিটি বাংলা ভাষায় প্রচলিত এবং ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক পরিভাষা প্রণয়নে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩.২.৩ আন্তঃভাষিক ঋণ

ঋণকরণ প্রক্রিয়াটি বিশুদ্ধ পরিভাষা তৈরির কৌশল না হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত। বিভিন্ন জ্ঞানশৃঙ্খলার পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রেই ঋণকরণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, তবে বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট পারিভাষিক শব্দে এ প্রক্রিয়ার ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়। প্রশ্ন হলো, ঋণকরণ সম্পর্কে কীরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত। প্রসঙ্গত, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মত বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি মূলত বৈজ্ঞানিক শব্দের ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দ অবিকল ব্যবহারের পক্ষপাতী। একই সঙ্গে, যেসব শব্দ ঋণকৃত হয়েই ভাষায় প্রচলিত সেসব শব্দও তিনি ব্যবহার করতে আগ্রহী (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্; ১৯৬২)। তাঁর এই মত ভাষা ও সাহিত্যের পরিভাষা প্রণয়নে ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেননা, বর্তমান আলোচনায় যেহেতু ভাষা ব্যবহারকারীদের পছন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে সেহেতু সেই নিরিখে প্রয়োজনানুসারে ঋণকরণের মধ্য দিয়ে পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন করা যেতে পারে। আন্তঃভাষিক এই ঋণকরণ সাধারণত দুভাবে হয়ে থাকে সরাসরি ঋণকরণ ও ঋণ অনুবাদ।

সরাসরি ঋণ : এ ধরনের প্রক্রিয়ায় একটি অভিধাকে ভাষাগত পরিবর্তন ছাড়াই অন্য ভাষায় পারিভাষিক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এরকম বহুল ব্যবহৃত অভিধা হল: tragedy - ট্র্যাজিডি, romanticism - রোমান্টিসিজম, spactrogram - স্পেক্টোগ্রাম, black english - 'ব্ল্যাক ইংলিশ', pidgin - 'পিজিন', creoal - 'ক্রেয়ল' ইত্যাদি। তবে ট্র্যাজিডি শব্দের বাংলা পরিভাষা হিসেবে কেউ কেউ 'বিয়োগান্তক নাটক' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করলেও তা প্রচলিত হয়নি বা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কেননা ট্র্যাজিডি শব্দটি যে চেতনাকে ধারণ করে বিয়োগান্ত শব্দের মধ্যে সম্যকভাবে সে তাৎপর্যটি পাওয়া যায় না।

অনুবাদ : অনেক সময় ঋণকৃত শব্দের ধারণা অভিন্ন রেখে অনুবাদের মাধ্যমে শব্দটি পারিভাষিক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : arm chair - আরাম কেদারা, structuralism - সংগঠনবাদ, epic - মহাকাব্য, lyric - গীতিকবিতা ইত্যাদি। বিভিন্ন জ্ঞানশৃঙ্খলায় অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা পারিভাষিক শব্দের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। হুমায়ুন আজাদের মতে, 'বাংলা ভাষায় পারিভাষিক শব্দের শতকরা নিরানব্বই ভাগই সম্ভবতই অনুবাদ শব্দ' (১৯৮৪ : ৬৬)।

৩.৩ পরিভাষার প্রয়োগতাত্ত্বিক দিক

প্রয়োগতত্ত্ব একটি পরিভাষার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতার সূচক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। একটি পরিভাষা গঠনগত দিক থেকে যতই সুনির্মিত হোক না কেন পরিভাষাটি যারা ব্যবহার করবে অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর কাছে যদি পরিভাষাটি গ্রহণযোগ্যতা না পায় তবে তা কাল ব্যবধানে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভাষা ব্যবহারকারীদের কাছে একটি পরিভাষা তখনই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যখন তারা তা প্রয়োগে সুবিধা লাভ করে। সাধারণত পরিভাষা একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানশৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই পরিভাষা সেই জ্ঞানশৃঙ্খলার সীমায় অবস্থিত নানা উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই উপাদানগুলো যেহেতু ওই জ্ঞানশৃঙ্খলা ব্যবহারকারী ভাষাগোষ্ঠীর কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেহেতু উল্লিখিত উপাদানসমূহের সঙ্গে পরিভাষাটি কতখানি অভিযোজিত হতে সক্ষম তার ওপরই মূলত তার প্রায়োগতাত্ত্বিক সাফল্য নির্ভর করে। এক কথায় বলা যায় যে, পরিভাষার সফলতা যাচাইয়ের ক্ষেত্র মূলত প্রয়োগতাত্ত্বিক পরিবেশ। প্রসঙ্গত, ভাষাবিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট একটি পরিভাষা supra segmental features বা 'অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য'কে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। লক্ষণীয় যে, পরিভাষাটির উৎস-শব্দে ধ্বনিমূলের কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই। তবু এর বাংলা পরিভাষায় এটি রাখা হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, পরিভাষাটি ধ্বনিতত্ত্বের তথা ধ্বনিমূলতত্ত্বের আলোচনায় ব্যবহৃত হয় বলে, যারা এটি ব্যবহার করবেন তারা যেন সহজে ব্যবহার করতে পারেন এবং সহজে অন্যকে বোঝাতে পারেন সেজন্য segmental অর্থে 'ধ্বনিমূলীয়' অংশটি ব্যবহৃত হয়েছে। segmental বলতে যদিও আক্ষরিকভাবে 'খণ্ডসম্পর্কিত' বোঝায় তবুও এখানে প্রয়োগতাত্ত্বিক বিবেচনায় 'ধ্বনিমূলীয়' ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োগতাত্ত্বিক দিক বিবেচনা করে পরিভাষায় সাধারণত দুই ধরনের গঠনকে চিহ্নিত করা যায় (Sager; ১৯৯০ : ৮০); যা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক অভিধা গঠন : প্রাথমিক অভিধা গঠন প্রক্রিয়ায় পারিভাষিক শব্দ একটি ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানশৃঙ্খলাটি অন্য কোনো ভাষার সূত্রে বিকশিত না হয়ে নিজ ভাষাতেই নিজস্ব একটি স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত অবস্থান অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ বাউল তত্ত্বের প্রসঙ্গ আনা যেতে পারে। এই তত্ত্বের নিজস্ব এমন অনেক পরিভাষা আছে যারা সাধারণভাবে একরকম অর্থে অভিহিত হয় আবার বাউল তত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : 'দেহ', 'পাখি', খাঁচা, 'ঘড়ি',

'নীর-ক্ষীর' প্রভৃতি। এগুলো বাংলা ভাষারই শব্দ, সাধারণভাবে ভাষায় বহুপ্রচলিত, কিন্তু বাউল-তাত্ত্বিক আলোচনায় এরা বিশেষ পারিভাষিক অর্থে সংজ্ঞাপিত। অর্থাৎ, শব্দগুলো তখনই পরিভাষা হয়ে ওঠে যখন তারা সুনির্দিষ্টভাবে একটি জ্ঞানশৃঙ্খলার সীমায় ব্যবহৃত হয় এবং ওই অভিন্ন জ্ঞানশৃঙ্খলার সীমায় অবস্থানকারী ভাষা ব্যবহারকারীরা শব্দগুলোকে প্রয়োগ করতে শুরু করে। বাউলতত্ত্বের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলা যেতে পারে, ওপরে নির্দেশিত শব্দগুলো যখন বাউল কবি, বাউল সাধক কিংবা বাউল গবেষক প্রয়োগ করেন তখনই সেগুলো বিশেষ পারিভাষিক অর্থপ্রাপ্ত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত শব্দগুলো কোনো ভিন্ন ভাষাজাত উৎস-শব্দ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পরিভাষার মর্যাদাপ্রাপ্ত। এর মূল কারণ হলো, এদের প্রয়োগতাত্ত্বিক কৌশল ও প্রকরণ। শব্দগুলোকে কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করছে এদের পরিভাষা হয়ে ওঠার বিষয়টি। প্রসঙ্গত আরও বলা যায় যে, প্রাথমিক অভিধা গঠনের সময় অভীষ্ট শব্দটির কোনো নতুন ভাষিক ভুক্তি থাকে না বিধায় এখানেই পারিভাষিক শব্দ গঠনের পদ্ধতি স্বাধীনভাবে প্রয়োগের সুযোগ বেশি।

দ্বৈতীয়িক অভিধা গঠন প্রক্রিয়া : দ্বৈতীয়িক অভিধা গঠন প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্টভাবে বিদ্যমান একটি ধারণা থেকে নতুন পরিভাষা তৈরি করা হয়। এই সুনির্দিষ্ট ধারণাটি কোনো ভিন্ন উৎস-ভাষা থেকেও উদ্ভূত হতে পারে, আবার আগে থেকেই লক্ষ্য-ভাষায় থাকতে পারে। কিন্তু যাই হোক না কেন, ওই ধারণাটিকে অবলম্বন করেই তখন এক বা একাধিক পরিভাষা তৈরি করা হবে। যেমন; 'paradigm' অভিধাটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'প্রকরণ' শব্দটি প্রচলিত রয়েছে। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা। এই ধারণা থেকে ভাষাবিজ্ঞানের শৃঙ্খলায় শব্দটি 'পদ প্রকরণ' হিসেবে পরিভাষাভুক্ত করা হয়। আবার এই 'পদ প্রকরণ' ধারণার ওপর ভিত্তি করে 'paradigmatic relation'-এর বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে, 'পদগত সম্পর্ক' যা ভাষাবিজ্ঞানে অন্যতম বিশেষ অভিধা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লক্ষণীয় যে, প্রাথমিক গঠন প্রক্রিয়া ও দ্বৈতীয়িক গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন — প্রাথমিক অভিধা গঠনে কোনো নতুন ভাষাতাত্ত্বিক ভুক্তির প্রয়োজন হয় না বলে এখানে ভাষিক সূত্র প্রয়োগের বিষয়টি জরুরি হয়ে পড়ে। অপরদিকে, দ্বৈতীয়িক অভিধা গঠন প্রক্রিয়ায় একটি মৌলিক ধারণাকে অবলম্বন করে, আরও বেশি সুনির্দিষ্ট করে এক বা একাধিক পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন করা হয়। তাই বলা যায়, প্রাথমিক অভিধা গঠন প্রক্রিয়ার চেয়ে দ্বৈতীয়িক অভিধা গঠন প্রক্রিয়া বেশি সাবলীল যা বিষয়ের নীতি বা মূল বৈশিষ্ট্য মেনে খুব সহজেই পরিকল্পনা করা যায়।

৪. উপসংহার

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আধুনিক কালে ভাষাবিষয়ক আলোচনার অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে পরিভাষা বিবেচিত হয়ে থাকে। পরিভাষা যেমন ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তেমনি ভাষীদের পরিচিত করে তোলে আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে। বর্তমান প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, বাংলা ভাষায় পারিভাষিক শব্দ নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা-পরিকল্পনার নিয়ম মেনে কোনো একক নীতিমালা অনুসরণ করে পরিভাষা প্রণয়ন করা হয়নি। সেজন্য

বাংলা পরিভাষার প্রয়োগ ও মান্যায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে বিবিধ সমস্যা। একটি ধারণা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে একাধিক পরিভাষা, একইভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিভাষা ধারণ করে একাধিক ধারণা। এরূপ জটিল ক্ষেত্রে বলা যায়, প্রচলিত বিকল্প পরিভাষাগুলো গঠনগতভাবে ত্রুটিযুক্ত না হলে যে বিকল্পটি প্রয়োগতাত্ত্বিকভাবে সফল ও সর্বাধিক গৃহীত সে পরিভাষাটিকেই মান্যরূপে নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিভাষা প্রণয়নের লক্ষ্যে কোনো ধারণা বা অভিধা ব্যবহারের জন্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। এতে ভাষিক শুদ্ধতা রক্ষা হয় এবং বিষয়টি যথার্থ হয়ে ওঠে। সাধারণত পরিভাষার ধারণা ব্যক্ত করার জন্য দ্ব্যর্থতামুক্ত শব্দ নির্বাচন করা প্রয়োজন যাতে ধারণাটি স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হয়। এক্ষেত্রে শব্দটির ব্যাকরণিক শুদ্ধতা নিরূপণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, কোনো পরিভাষা প্রণয়নের সময় প্রয়োজন উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন। সেই সঙ্গে, শব্দটিকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত, যোগাযোগক্ষম এবং নির্দিষ্ট শৃঙ্খলাসংশ্লিষ্ট ও সকলের কাছে বোধগম্য হতে হবে। একই সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, পরিভাষা গঠনের সময় যে শব্দগুলো সরাসরি গৃহীত হয় না, বরং এর পরিবর্তে কোনো মৌলিক ধারণা বা শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়, সেক্ষেত্রে অভিধাটি যতটা সম্ভব তার মৌলিক ভাবের কাছাকাছি রেখে গঠন করা বাঞ্ছনীয়। এ সকল দিক বিবেচনা করে সর্বোপরি একটি পারিভাষিক শব্দের প্রায়োগিক যথার্থতাকেই সবেচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। বর্তমান প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, কোনো পরিভাষার প্রয়োগের দিকটি সফলভাবে বিবেচনা করা না হলে সেই পরিভাষাকে স্থায়িত্ব প্রদান করা কষ্টসাধ্য। সবচেয়ে বড় কথা হলো, চূড়ান্ত বিচারে পরিভাষা একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া। যতই নীতি কিংবা নিয়ন্ত্রণ এই পরিভাষা তৈরির পেছনে সক্রিয় থাকুক না কেন, পরিভাষা-ব্যবহারকারীদের গবেষণা ও সাধনার সূত্র ধরে যথার্থ ও উপযুক্ত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এর সৃষ্টিশীলতা বিকশিত হয়। সুতরাং, পরিভাষার এই সজীবতা-গুণ এর প্রণয়ন, উন্নয়ন ও মান্যায়নের প্রধান শক্তি।

সহায়ক গ্রন্থ

তপোধীর ভট্টাচার্য, ২০০৭, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

পুণ্যশ্লোক রায়, ১৮৮০, "বাঙলা পরিভাষা সংকলনের রীতিনীতি", *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র), কলকাতা।

মনসুর মুসা, ১৯৯৫, *বাঙলা পরিভাষা: ইতিহাস ও সমস্যা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই, ১৯৯৪, "আমাদের সাহিত্যের ভাষা", 'ভাষা ও সাহিত্য', হুমায়ুন আজাদ (সম্পা.) *আবদুল হাই রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থে সংকলিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ১৯৬২, 'আমাদের পরিভাষার সমস্যা', *এলান*, ১১ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ঢাকা।

মুহাম্মদ এনামুল হক, ১৯৭৬, "পরিভাষা", *মনীষা-মঞ্জুষা* (২য় খণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা।

রত্না ঘোষ, ১৯৮৮, *বাংলা পরিভাষার দু'শ বছর*, সাহিত্যলোক, কলকাতা ।

রাজশেখর বসু, ১৩৪৬, "বাংলা পরিভাষা", *লঘুগুরু প্রবন্ধাবলী*, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১৩০১, "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা", হুমায়ুন আজাদ (সম্পা.), *বাঙলা ভাষা*, (২য় খণ্ড : ১৯৮৫) গ্রন্থে সংকলিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১৩০২, "রাসায়নিক পরিভাষা", হুমায়ুন আজাদ (সম্পা.), *বাঙলা ভাষা* (১ম খণ্ড : ১৯৮৪) গ্রন্থে সংকলিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৭১, "বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা", 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা (বৈশাখ), কলকাতা।

হুমায়ুন আজাদ (সম্পা.), ১৯৮৪, *বাঙলা ভাষা* (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (সম্পা.), ১৯৮৫, *বাঙলা ভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Sager, J.C. 1990. *A practical course in terminology processing.* Amsterdam : John Benjamins.

Sager, J.C. 1997. "Term formation". *Handbook of terminology management.* Sue Ellen Wright & Gerhald Budin (eds.). Amsterdam : John Benjamins, pp. 25-41.